বৃটিশ শাসনামলে সামাজিক সংস্কার ও স্বাধীকার আন্দোলন

ইউনিট ৮

ভূমিকা

আঠার শতকের শেষ পর্ব থেকে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দিয়ে এর সূচনা। উনিশ শতকে শুরু হয় বাংলায় সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে নানা সংস্কার। হিন্দু সমাজে সংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি মুসলমান সমাজেও কিছুটা বিলম্বে সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়। খ্রিস্টান মিশনারি স্যার উইলিয়াম কেরীর শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার বাংলার শিক্ষিত সমাজে আলোড়ন তৈরি করে। এর ধারাবাহিকতায় রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো সমাজ সংস্কারকগণ হিন্দু সমাজকে আধুনিকতার দিকে এগিয়ে নেন। কয়েক দশক পরে বাংলায় মুসলমান সম্প্রদায়কে শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এগিয়ে নেয়ার জন্য সংস্কার তৎপরতা চালান নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, হাজি মোহাম্মদ মহসীন প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। এছাড়াও মুসলমান সমাজে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনও পরিচালিত হয়। এই আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল সকল প্রকার সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার এবং অনৈসলামিক ভাবধারা বিসর্জন দিয়ে ইসলামের বিশুদ্ধ জীবন ধারায় ফিরে যাওয়া। এই লক্ষ্যে পূর্ব বাংলায় হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন, তিতুমীরের নেতৃত্বে পশ্চিম বাংলায় তরীকা-ই-মোহাম্মদীয়া আন্দোলন পরিচালিত হয়। এই দু'টি আন্দোলন মূলত ধর্ম ও সামাজিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে শুরু হলেও কৃষক প্রজাদের মধ্যে আন্দোলনের জনপ্রিয়তার কারণে শ্রেণি স্বার্থের দ্বন্দ্বে জমিদার ও নীলকরদের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি হয়। ইংরেজ সরকার জমিদার নীলকরদের পক্ষ অবলম্বন করায় পরিণতিতে এই সংস্কারমুখী প্রচেষ্টা ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়।

এ ইউনিট পাঠ শেষে আপনি বাংলায় সংঘটিত ফকির সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ, স্যার ইউলিয়াম কেরীর সংস্কার, হিন্দু ও মুসলমান সমাজে পরিচালিত সমাজ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনসমূহ এবং তিতুমিরের আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারবেন। এ সম্পর্কে নানা বিষয়ে ব্যাখ্যাও দিতে পারবেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-৮.১ ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ফকির ও সন্ন্যাসীদের জীবন-আচার সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- ইংরেজদের সাথে তাঁদের বিরোধের কারণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ফকির ও সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহকে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	ফকির ও সন্ন্যাসী আন্দোলন, কাছারী, নায়েব গোমস্তা, মজনুশাহ

আঠার শতকের শেষার্ধে বাংলায় ফকির ও সন্ন্যাসী আন্দোলন ছিল বৃটিশ বিরোধী একটি সশস্ত্র সংগ্রাম। এই সময় ফকির নামে পরিচিত মুসলমান সুফি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী নামে পরিচিত

মানুষ সমাজে ছিল। এই সংসার ত্যাগী সম্প্রদায়ের মানুষ দলবদ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াতো। ধর্মের কথা বলতো। সাধারণ মানুষ তাদের ভক্তি করত। মানুষের দেয়া তাদের চাল, ডাল সব্জিতে তাদেরা জীবন নির্বাহ হতো। ধর্মীয় উৎসব বা তীর্থস্থান দর্শন উপলক্ষ্যে এসকল ফকির সন্ন্যাসীরা সারা বছর একস্থান হতে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াতেন এবং পথে নিরাপত্তার জন্য তারা নানা ধরনের হাল্কা অস্ত্র সাথে বহন করতেন। প্রকৃত পক্ষে বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত এরা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতেন। জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ কৃষকের হয়ে মাঝে মাঝে তারা রুখে দাঁড়াতেন।

জমিদাররা তাই ফকির সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের ক্ষেপিয়ে তুলতো। এর প্রতিক্রিয়ায় ইংরেজ সরকার তাদের স্বাধীন চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। তীর্থস্থান দর্শনের উপর করারোপ করে। ভিক্ষা ও মুষ্টি সংগ্রহকে বে-আইনী ঘোষণা করে। পরিকল্পনা করে ফকির সন্ন্যাসীদের ডাকাত-দস্যু বলে মানুষের কাছে হেয় করে তুলতো। এসব কারণে ফকির-সন্ন্যাসীরা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তাই এক পর্যায়ে ফকির ও সন্ন্যাসীরা ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তাদের এ তৎপরতা ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় যা প্রায় চার দশক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

বিদ্রোহের গতি

ফকির ও সন্ন্যাসীরা সরকারি কুঠি, জমিদারদের কাছারী ও নায়েব গোমস্তার বাড়ি আক্রমণ করতো। লাঠি, বর্শা, তরবারী ও গাদা বন্দুক ছিল তাদের অস্ত্রশস্ত্র। চাকুরী হারা অনেক সৈনিক এবং দুর্দশাগ্রস্থ বহু কৃষক তাদের সংগ্রামে যোগ দেয়। ফকিরগণ বাংলার অধিবাসী হলেও তাদের আন্দোলনের প্রধান নেতারা ছিলেন অবাঙালি। বিদ্রোহী ফকিরদের নেতা ছিলেন মজনু শাহ এবং সন্ন্যাসীদের নেতা ছিলেন ভবানী পাঠক।

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম সংগ্রাম শুরু করে। এরপর একদল ফকির ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে বাকেরগঞ্জে কোম্পানির ফ্যাক্টরিতে হামলা করে। তাদের আক্রমণের মুখে কুঠির প্রধান মি. লিস্টার পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। ফকির দল বিনা বাঁধায় কুঠি দখল করে লুণ্ঠন করে। সে বছরেই সন্ন্যাসীরা রাজশাহীতে কোম্পানির ফ্যাক্টরিতে হানা দেয়। ফ্যাক্টরির প্রধান মি. বেনেটকে তারা বন্দি করে এবং পাটনায় নিয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করে। উত্তর বঙ্গে ফকির-সন্ন্যাসী তৎপরতা দমনের জন্য ক্যাপ্টন ডি. ম্যাকেঞ্জির নেতৃত্বে ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে রংপুরে এক অভিযান প্রেরিত হয়। সেই অভিযানের সময় ইংরেজ পক্ষের লেফটেন্যান্ট কিথ এবং তাদের অনেক সৈন্য নিহত হয়।

১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে ফকির মজনু শাহ সমগ্র উত্তরবঙ্গে ইংরেজ বিরোধী তৎপরতা গড়ে তোলেন। পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য কোম্পানিকে রংপুর ও দিনাজপুরে অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণ করতে হয়। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে মজনু শাহ দুই হাজার সশস্ত্র অনুগামীসহ রাজশাহী আক্রমণ করেন এবং কোম্পানির রাজস্ব অফিস লুণ্ঠন করেন। পরের বছর অন্য এক সংঘর্ষে সন্ন্যাসীদের হাতে ক্যাপ্টেন টমাস পরাজিত ও নিহত হন। মজনু শাহের সাথে ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সৈন্যধ্যক্ষ রবার্টসনের বাহিনীর এক তীব্র সংঘর্ষ হয়। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শেষে মজনু শাহ পালিয়ে যান। এরপরেও উত্তর বঙ্গ এবং ময়মনসিংহে ইংরেজ বাহিনীর সাথে মজনু শাহ-এর কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়েছিল।

ঐসব সংঘর্ষে মজনু শাহের রণকৌশল ছিল গেরিলা কায়দায় আক্রমণ ও নিরাপদে পলায়ন করা। কিন্তু কোম্পানির পক্ষে কখনো তাঁকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা সম্ভব হয় নি। ফকির মজনু শাহ ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর ফকির দলের নেতৃত্ব দেন মুসা শাহ, সোবহান শাহ, চেরাগ আলী শাহ, করিম শাহ, মাদার বক্স প্রমুখ ফকিরগণ। এঁরাও কয়েক বছর কোম্পানিকে ব্যতিব্যস্ত রাখেন। কিন্তু নেতৃত্বের কোন্দল, সংঘবদ্ধতার অভাব, সরকারী বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে ফকিরদের প্রতিরোধ আন্দোলন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তাঁরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতা ভবানী পাঠকের সঙ্গে ফকির দলনেতা মজনু শাহের যোগাযোগ ছিল। রংপুর, রাজশাহী ও বগুড়া অঞ্চল ছিল তাঁর আশ্রয়স্থল। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের অধীনে একদল বৃটিশ সৈন্যের আক্রমণে ভবানী পাঠক ও তাঁর দুই সহকারী নিহত হন এবং অপর ৪২ জন বন্দি হয়। দেবি চৌধুরাণী নামের একজন ছোট জমিদারের সঙ্গে ভবানী পাঠকের যোগাযোগ ছিল বলে এক সরকারী নথিতে উল্লেখ রয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের ফলে ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন এক সময় স্তিমিত হয়ে গেলেও এতে বৃটিশ বিরোধী জনমত গড়ে উঠে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ ফকির সন্নাসীদের সাথে ইংরেজদের যুদ্ধের উপর ভিত্তি করে একটি নাটিকা মঞ্চস্থ করবেন।

সারাংশ

বাংলার ফকির ও সন্ন্যাসী আন্দোলন ছিল একটি বৃটিশ বিরোধী সংগ্রাম। ইংরেজ সরকার ফকির ও সন্ন্যাসীদের চিরাচরিত জীবন ধারায় বাঁধা সৃষ্টি করলে তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং প্রতিরোধ সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে। মজনু শাহের নেতৃত্বে ফকিররা সুদীর্ঘ সময় ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। মজনু শাহের মৃত্যুর পর উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে তাদের সংগ্রামের অবসান ঘটে। সন্ন্যাসী আন্দোলনে প্রধান নেতা ছিলেন ভবানী পাঠক। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের এক পর্যায়ে ভবানী পাঠকের মৃত্যু হলে এই আন্দোলনেরও অবসান ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলায় ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন শুরু হয়
ক) ১৭৫০ খ্রি. খ) ১৭৫৭ খ্রি. গ) ১৭৬০ খ্রি. ঘ) ১৭৬৫ খ্রি.

২। সন্ন্যাসীরা পাটনায় নিয়ে হত্যা করে–
ক) মি. লিস্টারকে খ) ডি. ম্যাকেঞ্জিরকে গ) মি. বেনেটকে ঘ) লেফটেন্যান্ট কিথকে

৩। ফকির মজনুশাহ মারা যান–
ক) ১৭৮৬ খ্রি. খ) ১৭৮৭ খ্রি. গ) ১৭৮৮ খ্রি. ঘ) ১৭৮৯ খ্রি.

৪। জমিদার দেবী চৌধুরানির সাথে যোগাযোগ ছিল কার?
ক) ভবানী পাঠকের খ) মজনুশাহের গ) আহম্মদ শাহের ঘ) দুদু মিয়ার

পাঠ-৮.২ স্যার উইলিয়াম কেরী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- স্যার উইলিয়াম কেরীর পরিচয় এবং বাংলায় তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- উইলিয়াম কেরী এদেশে আধুনিক শিক্ষা বিকাশে কী ভূমিকা রেখেছিলেন তার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ এবং সংবাদপত্র প্রকাশে কেরীর অবদান বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	উলিয়াম কেরী, বাংলা ভাষা, সতিদাহ প্রথা

সতের শতক থেকেই বাংলায় খ্রিস্টান মিশনারিরা সীমিতভাবে ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে মিশনারিদের তৎপরতা অনেক বেড়ে যায়। বিশেষ করে উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটির আগমনের মধ্যদিয়ে প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদ প্রচারিত হতে থাকে।

উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪ খ্রি.) ছিলেন একজন ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি। তাঁকে আধুনিক যুগের খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদের জনক (father of modern missions) বলা হয়। তিনি ছিলেন ডেনমার্কের অধিবাসী। জসুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড নামের দুই বন্ধুকে নিয়ে উইলিয়াম কেরী ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে আসেন। তিনি হুগলি জেলার সিরামপুরে একটি মিশন প্রতিষ্ঠা করে ধর্মপ্রচারের যাত্রা শুরু করেছিলেন। সিরামপুর মিশন কালক্রমে খ্রিস্টধর্ম বিকাশ ও নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই মিশনের উদ্যোগে উইলিয়াম কেরীর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় স্কুল। এর কারিকুলামে যুক্ত করা হয়েছিল আধুনিক বিজ্ঞান, ভূগোল এবং ইতিহাস। সিরামপুর মিশনের উদ্যোগে স্কুলগুলোর

জন্য বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক লেখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। পুস্তক মুদ্রণের জন্য এই মিশনে স্থাপন করা হয় ছাপাখানা। কেরী জার্মানি থেকে মুদ্রণযন্ত্র ক্রয় করে এনেছিলেন। উইলিয়াম কেরী ও তাঁর বন্ধুরা ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা টেক্সটবুক সোসাইটি স্থাপন করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্য এখান থেকে পুস্তক ছাপা হতো। উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে সিরামপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে খ্রিস্টান ও অ-খ্রিস্টান সকল শিক্ষার্থীকেই শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্ব পড়ানো হতো। এই মিশন পরিচালনার জন্য ডেনমার্কের রাজা ষষ্ঠ ফ্রেডারিক ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে একটি চার্টার অনুমোদন করেন।

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ছাড়াও সিরামপুর মিশন বাংলা ভাষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এরমধ্যে ছিল অভিধান প্রণয়ন ও ব্যকরণ গ্রন্থ রচনা। এছাড়াও উইলিয়াম কেরী বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। এ ব্যাপারে মিশনারীদের সাহায্য করেছিলেন রামরাম বসু। তিনি নিজে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ না করলেও মিশনারীদের নানাভাবে সহায়তা করেন। বাইবেল অনুবাদে তাঁর প্রত্যক্ষ সহায়তা ছিল। রামরাম বসু খ্রিস্টধর্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। এই মিশন থেকে 'দিগদর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ' নামে দুটি সাময়িকীও প্রকাশ করা হয়। এভাবেই এদেশে বাংলা সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু হয়। 'দি ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' নামে একটি ইংরেজি পত্রিকাও প্রকাশিত হয় সিরামপুর মিশন থেকে। এটিই ছিল 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকার আদি রূপ। উদ্ভিদচর্চা এবং কৃষি উন্নয়নেও উইলিয়াম কেরী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। উদ্ভিদ উন্নয়ন ও গবেষণার জন্য তিনি হাওড়ার কাছে শিবপুরে একটি বোটানিক্যাল গার্ডেন বা উদ্ভিদ উদ্যান তৈরি করেছিলেন। তিনি পৃথিবীর নানা দেশ থেকে উদ্ভিদ বীজ এনে এখানে বপন করেন। কেরীর এই প্রচেষ্টার ফল ছিল উত্তরকালে প্রতিষ্ঠিত 'এগ্রি-হর্টিকালচার সোসাইটি অব ইন্ডিয়া'। হিন্দু ধর্মের ভেতর কোনো কোনো ক্ষেত্রে অমানবিক আচরণ ছিল। যেমন সতীদাহ প্রথা বা কালাপানি (সমুদ্র) পাড়ি দেয়ায় নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি। এসবের বিরুদ্ধে কেরী জনমত তৈরি করতে এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ উলিয়াম কেরির জীবন ও কর্ম নিয়ে একটি রচনা লিখবেন।

সারাংশ

উনিশ শতককে বাংলায় নানা ধরনের সংস্কার চলছিল। এই সকল সংস্কারের মধ্যদিয়েই বাংলার মানুষ শিক্ষা ও চিন্তায় নিজেদের যুক্ত করে। আর এই সংস্কারের যাত্রা শুরু হয়েছিল খ্রিস্টান মিশনারি স্যার উইলিয়াম কেরীর মাধ্যমে। তিনি তাঁর সিরামপুর মিশনকে ঘিরে আধুনিক শিক্ষার যাত্রা শুরু করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় গঠিত হয় স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড, ছাপাখানা প্রভৃতি। তাঁর মিশন থেকে প্রকাশিত হয় সংবাদপত্র। তিনি কৃষি উন্নয়নেও ভূমিকা রেখেছিলেন। তাছাড়া হিন্দু সমাজে প্রচলিত অমানবিক সতিদাহ প্রথা বন্ধের জন্যও তিনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪ খ্রি.) কে ছিলেন?

ক) ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি খ) যোদ্ধা গ) খেলোয়াড় ঘ) কবি

২। 'দি ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' নামে ইংরেজি পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় কোথা থেকে?

ক) সিরামপুর মিশন খ) ভাগলপুর মিশন গ) রামপুর মিশন ঘ) সৈয়দপুর মিশন

৩। নিচের কোনটি সঠিক?

i. উইলিয়াম কেরী ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে আসেন
ii. ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা টেক্সটবুক সোসাইটি স্থাপিত হয়
iii. কৃষি উন্নয়নেও উইলিয়াম কেরী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.৩ রাজা রাম মোহন রায় ও ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- উনিশ শতকে কেন হিন্দু সমাজ সংস্কারে সংস্কারকগণ এগিয়ে এসেছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- রাজা রামমোহন রায় হিন্দু সমাজকে কীভাবে আধুনিক জীবনের দিকে নিয়ে এসেছিলেন তা লিখতে পারবেন।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার কার্যক্রম বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	রাজা রাম মোহন রায়, রাষ্ট্র সমাজ, বিদ্যাসাগর

পাঠ-৩: হিন্দু সমাজ সংস্কার

উনিশ শতকে ভারতে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সাথে ধর্মসংস্কার ও শিক্ষান্নোয়নের একটি সম্পর্ক ছিল। বাংলার হিন্দু সমাজ সংস্কারে অভিন্ন বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করা যায়। ইংরেজদের আগমন ও ক্ষমতাসীন হওয়া বাংলার সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান দুই সমাজেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে শাসক ইংরেজদের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ অনুমোদন দেয়নি ইংরেজদের সংস্পর্শে আসার। ইংরেজ সান্নিধ্যকে তারা ধর্মীয় অনাচার হিসেবে মনে করতে থাকে। একারণে আধুনিক ইউরোপীয় জ্ঞানের সাথে নিজেদের যুক্ত করতে পারে নি। ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণকে পাপ বিবেচনা করতে থাকে। এই বাস্তবতায় হিন্দু সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করে আধুনিকতার পথে এগিয়ে এনেছিলেন যেকজন বাঙালি সংস্কারক তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪- ১৮৩৩ খ্রি.)

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রামমোহন রায় উনিশ শতকের একজন ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে এক হিন্দু পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। রামমোহন রায়ের পারিবারিক ধর্মীয় ঐতিহ্য সে যুগের বিচারে ব্যাতিক্রমী ছিল। রামমোহন রায়ের পরিবার রাঢ়ী ব্রাহ্মণ। পারিবারিক উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ঠাকুরদা কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'রায়' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায় বৈষ্ণব মতবাদ গ্রহণ করেন। অন্যদিকে তাঁর মা তারিণী দেবী শৈব পরিবারের মেয়ে ছিলেন। এসব কারণেই সম্ভবত একটি উদার ও মিশ্র ধর্মীয় অবয়বের ভেতর অনেকটা মুক্ত মানসিকতায় বেড়ে উঠেছিলেন রামমোহন রায়। তাই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা তাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

রাজা রামমোহন রায় একজন ধর্ম সংস্কারক ও শিক্ষা সংস্কারক হিসেবে পরিচিত হলেও সমাজ সংস্কারক হিসেবেই তাঁর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে উজ্জ্বল। তাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল।

রামমোহন রায় ১৮১৫ সালে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে কলকাতাতে চলে আসেন। এসময় থেকে তিনি সমাজ সংস্কারে নিবেদিত হন। এখানে তিনি সমমনা বন্ধুদের একত্রিত করে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এর নাম হয় 'আত্মীয়সভা'। নিয়মিত আলোচনা সভার আয়োজন করা হতো এখানে। ধর্মীয় ও সামাজিক নানা সমস্যা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হতো। এই সভায় দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মত বরেণ্য ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকতেন।

সাধারণ হিন্দুদের ভেতর মুক্তচিন্তা ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে রামমোহন রায় সংবাদপত্র প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই লক্ষ্যে ১৮২১ সালে প্রকাশ করেন *সংবাদ কৌমুদী* নামে একটি বাংলা সংবাদপত্র। পরের বছর ফারসি ভাষায় আরেকটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এর নাম ছিল *মিরাত উল আখবার*।

রামমোহন রায় মূর্তিপূজা বিরোধী বক্তব্য উপস্থাপনের পক্ষে সমর্থন পেলেন উপনিষদ থেকে। উপনিষদে বহু দেবদেবির পরিবর্তে নিরাকার ব্রহ্মার উপাসনার কথা রয়েছে। এই সূত্রেই তিনি ১৮২৮ সালে 'ব্রাহ্মসভা' নামে একটি সংগঠনের জন্ম দেন। এখানে নিরাকার ব্রহ্মার স্মরণে ধর্মসঙ্গীত গেয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু করা হয়। পরবর্তী সময়ে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেলে ব্রাহ্মসভা 'ব্রাহ্মসমাজ' নামে আত্মপ্রকাশ করে।

বহুকাল আগে থেকেই হিন্দু সমাজে অনেক কুপ্রথা প্রচলিত হয়েছিল। এর অন্যতম হচ্ছে সতী। সতীদাহ প্রথা অনুসারে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে স্বামীর চিতায় জীবন্ত পেড়ানো হতো। গোঁড়া হিন্দুদের প্রবল প্রতিরোধের মধ্যেও রামমোহন রায় সতীদাহের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে থাকেন। তিনি প্রভাবিত করতে থাকেন কোম্পানির শাসকদের। এই সূত্রে ১৮২৯ সালে গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের অনুমোদনে সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত ঘোষণা করে আইন পাশ হয়।

রামমোহন রায়কে সাধারণভাবে রাজা রামমোহন রায় বলা হয়। তিনি রাজা উপধিটি পেয়েছিলেন সেসময়ের নামেমাত্র মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের (১৮০৬-১৮৩৭) কাছ থেকে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রি.)

বিদ্যাসাগর উপাধিতে সমধিক পরিচিত হলেও এই ক্ষণজন্মা পুরুষের প্রকৃত নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন বাঙালি নবজাগরণের একজন পুরাধা ব্যক্তিত্ব। বিদ্যাসাগর ছিলেন একাধারে দার্শনিক, শিক্ষানুরাগী, শিক্ষক, লেখক, অনুবাদক, মুদ্রাকর, প্রকাশক, সমাজ সংস্কারক এবং ব্যাকরণবিদ। তিনি সহজবোধ্য আধুনিক বাংলা গদ্য রচনার পথপ্রদর্শক ছিলেন। কোলকাতার সংস্কৃত কলেজ পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভূষিত করে।

১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কলেজে সহকারী সেক্রেটারি পদে যোগদান করেন। ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় বেশকিছু পরিবর্তন আনার সুপারিশ করেন। ১৮৪৯ সালে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ পান। একই কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব লাভ করেন ১৮৫১ সালে। ১৮৫৫ সালে তিনি বিশেষ স্কুল পরিদর্শকের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন।

সমাজ সংস্কারে ভূমিকা: দীর্ঘদিন থেকে প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে এসময় ভারতীয় নারীরা দুর্দশাগ্রস্ত ছিলেন। এই অবস্থা ব্যাথিত করেছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। বিশেষ করে হিন্দু মেয়েদের বাল্যবিয়ে প্রচলিত থাকা এবং বিধবা বিয়ে নিষিদ্ধ থাকাকে তিনি অন্যায় ও অমানবিক মনে করেছিলেন। সামাজিক প্রথামতে কোনো মেয়ের বারো বছরের মধ্যে বিয়ে না হলে তা সামাজিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হতো। এমন পরিবারকে নানাভাবে নিগৃহীত হতে হতো। কখনো কখনো পুরো পরিবারকে গ্রাম ছাড়া করা হতো। আবার ব্রাহ্মণ কন্যাকে কুলিন ব্রাহ্মণ ছাড়া বিয়ে দেয়া যাবে না বলে সমাজ বিধান ছিল। ফলে এক ধরনের কুলিন ব্রাহ্মণের বিয়ে করা পেশা হয়ে দাঁড়ায়। সামাজিক চাপে পড়ে সাত বছরের কন্যার সাথে সত্তর বছরের কুলিন ব্রাহ্মণ বৃদ্ধের বিয়ে হওয়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। স্বাভাবিক নিয়মেই এই বৃদ্ধদের বা অন্য বয়সী বরদের মৃত্যু হলে বালিকা বধূ বিধবা হয়ে যেত। কিন্তু এদের আর পুনরায় বিয়ে করার অনুমতি ছিল না। উপরন্তু এই বাল্য বিধবাদের সারাজীবন নানা আচার অনুষ্ঠান পালন করে চলতে হতো। বাল্যবিয়ের কুফল এবং বিধবাদের করুণ জীবন ঈশ্বরচন্দ্রকে ব্যাথিত করে।

ঈশ্বরচন্দ্রের চেষ্টায় ভারত সরকার এগিয়ে আসে। অবশেষে ১৮৫৬ সালে বিধবা পুনর্বিবাহ আইন পাশ হয়। সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করার জন্য বিদ্যাসাগর নিজের পুত্রকেও একজন বিধবার সাথে বিয়ে দেন। বিধবা বিয়ে কার্যকর করা, দ্বিতীয় বিয়ে ও বাল্যবিয়ে রোহিতকরণ এং বিধবা বিয়েকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ১৮৭২ সালে সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্ট পাশ করা হয়। এই আইন পাশেও বিদ্যাসাগরের যথেষ্ট অনুপ্রেরণা ছিল।

বিদ্যাসাগর বিশেষ স্কুল পরিদর্শক থাকার সুবিধায় শিক্ষা বিস্তার ও নারী শিক্ষার প্রণোদনা দানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জমিদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বিদ্যালয় গড়ায় উৎসাহ দিতেন। তিনি অনেক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি নিজ অর্থ ব্যয়ে ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষা বিস্তারে এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

১৮৯১ সিালের ২৯ জুলাই এই মহৎপ্রাণ সমাজ সংস্কারক ও পণ্ডিত ব্যক্তির জীবন অবসান ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

সারাংশ

কুসংস্কারে জর্জরিত পিছিয়ে পড়া হিন্দু সমাজকে আধুনিকতার দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। উনিশ শতকে বাংলায় এই এই সংস্কারের দায়িত্ব নিয়ে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তারা হিন্দু সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করেন। নতুন নতুন স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন। সংস্কারবাদী সংগঠন গড়ে তুলেন। সতীদাহের মতো কুপ্রথা বন্ধে আইন

পাশে ভূমিকা রাখেন। এই সংস্কারের পথ ধরেই বাল্যবিয়ে বন্ধ ও বিধবা বিয়ে প্রবর্তনে আইন পাশ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সতীদাহের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে থাকেন কে?
ক) রামমোহন রায় খ) কেদার রায় গ) মানিক রায় ঘ) চাঁদ রায়

২। বিধবা পুনর্বিবাহ আইন পাশ হয় কার চেষ্টায়?
ক) ভাদারাম পোদ্দার খ) সতীনাথ ভাদুড়ী গ) অখিলেশ সাহানী ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

৩।
i. ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ পান
ii. রামমোহন রায় মুর্শিদাবাদ ছেড়ে কলকাতাতে চলে আসেন।
iii. রামহোমন রায় মূর্তিপূজা করতেন।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.৪ হাজী শরিয়ত উল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা হাজী শরিয়ত উল্লাহর জীবন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ফরায়েজি আন্দোলনের প্রকৃতি কী ছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- ফরায়েজি আন্দোলনে হাজী শরিয়ত উল্লাহ ও দুদু মিয়ার ভূমিকার বর্ণনা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	হাজী শরিয়ত উল্লাহ, ফরায়েজি আন্দোলন, দুদু মিয়া

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে এক ধর্মীয় সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। মুসলমান সমাজে নানাবিধ কুসংস্কার ও অনৈসলামিক কার্যকলাপ লক্ষ করে হাজী শরিয়ত উল্লাহ্ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার আদর্শে স্ব-ধর্মাবলম্বীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য যে আন্দোলন পরিচালনা করেন তা 'ফরায়েজি আন্দোলন' নামে পরিচিত।

হাজী শরিয়ত উল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০ খ্রি.)

বর্তমান শরিয়তপুর জেলার শ্যামাইল গ্রামে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে শরিয়তউল্লাহর জন্ম হয়। ছেলেবেলায় তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে যান কলকাতায়। হুগলী জেলার ফুরফুরায় দুই বছর আরবি ও ফারসি শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৭৯৯ সালে তিনি তাঁর ওস্তাদ মাওলানা বাশারত আলীর সাথে মক্কায় যান এবং হজ্ব সম্পন্ন করেন। সেখানে তিনি ওয়াহাবি ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৮১৮ সালে দেশে ফিরে তিনি ফরায়েজি আন্দোলন নামে ইসলামি সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন।

হিন্দু সমাজে যখন সংস্কার চলছিল ঠিক একই সময়ে বাংলার মুসলমান–বিশেষ করে পূর্ববাংলার মুসলমানদের কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে মুক্ত করার জন্য বেরিয়ে আসেন হাজী শরিয়ত উল্লাহ। শরিয়ত উল্লাহ লক্ষ করেছিলেন ইংরেজ শাসিত এদেশে মুসলমানরা নানা ক্ষেত্রে পিছিয়ে পরেছে। স্থানীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির আচার আচরণ নিজেদের জীবনে প্রবেশ করায় ইসলামের মূল শিক্ষার প্রতি তারা উদাসীন হয়ে পড়েছে। এ কারণে ফরায়েজি আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি মনোযোগী করে তাদের শক্তি জাগিয়ে তোলা। একই উদ্দেশ্যে এই আন্দোলনের

মধ্যদিয়ে মুসলমানদের ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও অনুশাসন পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং সব ধরনের কুসংস্কার থেকে মুক্ত করারও প্রচেষ্টা নেয়া হয়। ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি জমিদার, নীলকর, মহাজন ও স্থানীয় প্রশাসনের শোষণ ও অত্যাচার থেকে কৃষকদের মুক্ত করাও ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য।

হাজী শরিয়তউল্লাহ তাঁর আন্দোলনের প্রধান বক্তব্য হিসাবে ইসলামের ৫টি মৌলিক আদর্শের ভেতর মুসলমানদের নিষ্ঠাবান থাকার নির্দেশ দেন। এই মূল আদর্শসমূহের ব্যতিক্রম কাজকে তিনি শিরক ও বিদাত বলে ঘোষণা দেন। ফরায়েজীরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে জন্মদিন, বিয়ে, মৃত্যু প্রভৃতির সাথে যুক্ত আচার অনুষ্ঠান, পীরপূজা, পীরের প্রতি অতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, তাজিয়া নির্মাণ ও মহররম মিছিল।

হাজী শরিয়ত উল্লাহর জীবদ্দশায় ফরায়েজি আন্দোলন ফরিদপুর ছাড়াও ঢাকা, বরিশাল ও কুমিল্লা জেলায় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। শরিয়ত উল্লাহ বুঝেছিলেন মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের নীতি ছিল শত্রুতামূলক। একারণে মুসলমানরা শিক্ষাদীক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছিল। তিনি মুসলমানদের বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, রাজনৈতিকভাবে তারা আর স্বাধীন নয়। তাদের দেশ এখন 'দারুল হারব' অর্থাৎ যুদ্ধরত বা অমুসলিমের দেশ। এমন দেশকে হয় শক্তি প্রয়োগ করে মুসলমান শাসিত দেশ অর্থাৎ 'দারুল ইসলাম' বানাতে হবে অথবা দারুল হারব ছেড়ে অন্যকোনো মুসলমানের দেশে চলে যেতে হবে। এর কোনোটি করা সম্ভব না হলে মুসলমানদের কয়েকটি নিয়ম মেনে এ দেশে থাকতে হবে। এ কারণেই শরিয়ত উল্লাহ ঘোষণা দেন দারুল হারবে মুসলমানদের ঈদ ও জুমুয়ার নামাজ পড়ার প্রয়োজন নেই। শুধু ফরজ ইবাদতটুকু করবে। এ কারণেই আন্দোলনটির নাম হয় ফরায়েজি আন্দোলন। অর্থাৎ শরিয়ত উল্লাহ এমন প্রতীকী নিয়ম পালনের মধ্যদিয়ে বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় পরিচয়ে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। এভাবে হাজী শরিয়ত উল্লাহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে পরিশুদ্ধির মাধ্যমে মুসলমানদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন।

ইংরেজ সিভিলিয়ান জেমস ওয়াইজ হাজী শরিয়ত উল্লাহকে মুসলমান কৃষকদের উজ্জীবিত করার কাজে একজন নিবেদিতপ্রাণ নেতা বলে উল্লেখ করেছেন। লক্ষ করা গিয়েছে যেসব অঞ্চলে ফরায়েজি আন্দোলন জনপ্রিয় হয়েছে সেখানে হিন্দু জমিদার ও নীলকররা শক্তিশালী ছিল এবং এদের দ্বারা কৃষকরা অত্যাচারিত হতো। কঠোরভাবে ধর্ম সংস্কার করায় এক শ্রেণির মুসলমান নেতা শরিয়ত উল্লাহর আন্দোলনকে সমর্থন করেননি। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী। এই মতবিরোধের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন হিন্দু জমিদাররা। তারা কৌশলে রক্ষণশীল মুসলমান কৃষকসহ নীলকরদের ফরায়েজিদের বিরুদ্ধে একত্রিত করেন। এভাবে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ফরায়েজিরা একটি সংঘাতময় অবস্থার মুখোমুখি হয়। এমন একটি পরিস্থিতি যখন বিরাজমান তখনই হাজী শরিয়ত উল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। এবার ফরায়েজিদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তাঁর পুত্র মুহসীন উদ্দিন দুদু মিয়া।

দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬২খ্রি.)

দুদু মিয়া ছিলেন শরিয়ত উল্লাহর একমাত্র পুত্র। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে পৈত্রিক গ্রামেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর দুদু মিয়া ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

শিক্ষা গ্রহণের জন্য পিতার জীবদ্দশাতেই দুদু মিয়া মক্কা যান। সেখানে পাঁচ বছর কাটান তিনি। পিতার অসুস্থতার সংবাদে উনিশ বছর বয়সে দেশে ফিরে আসেন দুদু মিয়া। এ সময় হিন্দু জমিদার, নীলকর, কোনো কোনো রক্ষণশীল মুসলিম নেতা ফরায়েজিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। তারা প্রায়ই ফরায়েজিদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করতো। দুদু মিয়া ছিলেন বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন ও কূটনৈতিক জ্ঞানে দক্ষ।

দুদু মিয়া ঘোষণা করেন জমির মালিক হবে কৃষকেরা। তাঁর এই ঘোষণা নির্যাতিত কৃষকদের মনে আশার সঞ্চার করে। ফলে ফরায়েজি আন্দোলনও পায় নতুন গতি। দুদু মিয়া অবশ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক ক্ষমতাকে অস্বীকার করেন নি। ইংরেজ অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে রেখেছিলেন। এক ধরনের সহযোগিতার মধ্যদিয়ে দুদু মিয়া প্রজার অধিকার রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিপ্লবের পর দুদু মিয়াকে সরকার বন্দি করে। তাঁকে কলকাতার আলীপুর কারাগারে আটক রাখা হয়। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তি পান তিনি। দুদু মিয়া ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

জমিদার, নীলকর ও ইংরেজ প্রশাসনের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে ফরায়েজি আন্দোলন বেশি দিন টিকে থাকতে পারে নি। দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর ক্রমশ এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়। তবে বাঙালির জাগরণে এই আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

ছিল। ফরায়েজি আন্দোলনের ভেতর ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি থাকায় সাধারণ হিন্দু-মুসলমানকে শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে তোলা সহজ ছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ হাজী মুহম্মদ মুহসীনের জনকল্যান ও হাজী শরিয়তউল্লাহ ফরায়েজি আন্দোলনের উপর একটি আলোচনা সভার আয়োজন করবেন।

সারাংশ

হাজী মুহম্মদ মুহসীন ছিলেন জনকল্যাণে নিবেদিত। জীবিতকালে তিনি যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরিতে অর্থ প্রদান করেছেন পরবর্তীকালে তার প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্ট ফান্ড শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রেখেছে। হাজী শরিয়ত উল্লাহ পরিচালিত ফরায়েজি আন্দোলন মূলত একটা ধর্ম সংস্কার আন্দোলন। বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে যে সব অনৈসলামিক ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল হাজী শরিয়ত উল্লাহ্ সেগুলো বর্জন করার জন্য তাদেরকে আহবান জানান। বহু লোক তাঁর আহবানে সাড়া দিলেও প্রাচীনপন্থীরা তাঁর বিরোধিতা করে। কৃষকদের উপর জমিদারদের অত্যাচারের কারণে এ আন্দোলন জমিদার বিরোধী সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। মুহসীন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছিরেন কে?
- ক) মুহসীনের বোন
- খ) মুহসীন নিজে
- গ) সরকার
- ঘ) স্থানীয় জনগন

২। ফরায়েজি আন্দোলনের প্রবর্তক
- ক) দুদু মিয়া
- খ) হাজী শরীয়ত উল্লাহ
- গ) মজনু শাহ
- ঘ) আহমদ শাহ

৩। হাজী শরীয়ত উল্লাহ কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?
- ক) মাদারীপুরে
- খ) শরিয়তপুরে
- গ) ফরিদপুরে
- ঘ) ত্রিপুরায়

৪। শরীয়ত উল্লাহ হজ্জ করতে মক্কা শরীফ গমন করেন
- ক) ১৭৯৭ খ্রি.
- খ) ১৭৯৮ খ্রি.
- গ) ১৭৯৯ খ্রি.
- ঘ) ১৮০০ খ্রি.

৫। হাজী শরীয়ত উল্লাহ মক্কায় অবস্থান করেন
- ক) ২০ বছর
- খ) ২১ বছর
- গ) ২২ বছর
- ঘ) ২৩ বছর

সৃজনশীল প্রশ্ন

করিমুল্লাহ ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি কোলকাতায় শিক্ষা লাভ করেন। ১৮ বছর বয়সে তিনি তার শিক্ষকের সাথে পবিত্র হজ্জব্রত পালনের জন্যে মক্কা শরীফ গমন করেন এবং দীর্ঘ বিশ বছর মক্কায় অবস্থান করে যুগশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের নিকট ইসলাম ধর্মের উপর লেখা পড়া করে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। দেশে ফিরে তিনি ইসলামে অননুমোদিত আচার ও প্রথা ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে যা অবশ্য করণীয় অর্থাৎ 'ফরজ' তা মেনে চলা ও পালন করার জন্য মুসলমান সমাজকে আহ্বান জানান।

ক. হাজী শরীয়ত উল্লাহ পরিচালিত আন্দোলনের নাম কী? ১

খ. শিরক বা মহাপাপের কাজ কাকে বলে? ২

গ. উদ্দীপকের করিমুল্লাহর আন্দোলনের সাথে পাঠ্য পুস্তকের যে আন্দোলনের সাদৃশ্য আছে তা ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৮.৫ তিতুমীরের আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- তিতুমীরের আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি ছিল তা বলতে পারবেন।
- তিতুমীরের আন্দোলনের চরিত্র সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আন্দোলনের ঘটনাবলির একটি বর্ণনা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	তিতুমীর, জমিদার, প্রজা, নারিকেলবাড়িয়া

পূর্ব বাংলায় (আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ) যখন ফরায়েজি আন্দোলন গড়ে উঠে, প্রায় একই সময়ে পশ্চিম বাংলায়ও আরেকটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। তিতুমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত 'তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া' আন্দোলন ছিল উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদ শহীদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। এ আন্দোলনেরও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রচলিত কুসংস্কার এবং অনৈসলামিক রীতিনীতি দূর করে ইসলামের আদর্শে বাংলার মুসলিম সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করা। কিন্তু কৃষক সম্প্রদায়কে সংগঠিত করার কারণে জমিদারদের সাথে সংঘাত সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত এটি সরকার বিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয়।

মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি গ্রামের এক মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেন এবং সে গ্রামের ব্যায়ামাগারে কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে একজন কুস্তিগীর হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিছুদিন তিনি নদীয়ার এক জমিদারের লাঠিয়ালের চাকরি করেন। পরে মক্কা শরীফে হজ্জ করতে যান। সেখানে তিনি বিখ্যাত আলেম ও বিদ্রোহী নেতা সৈয়দ আহমদ শহীদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮২৭ সালে দেশে ফিরে তিতুমীর ধর্ম সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

ঐ যুগে বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। তিতুমীর মুসলমানদেরকে পীরের কাছে নত হওয়া, মাজার তৈরি করা, মৃতের উদ্দেশ্যে কিছু নিবেদন করা, মহররম অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া ইত্যাদি বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দেন। হিন্দু বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি বসবাস করার ফলে মুসলমানদের সংস্কৃতি ও সমাজ জীবনে যে ভিন্ন প্রভাবের অনুপ্রবেশ ঘটে, সে সমস্ত দূর করে ইসলাম ধর্মের আদি বিশুদ্ধতা ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি প্রচেষ্টা চালান। অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকশ মুসলমান তিতুমীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তারা দাঁড়ি রাখত এবং বিশেষ পোশাক পরত। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে এমন গোঁড়ামী সৃষ্টি হয় যে, অন্য মুসলমানদের সঙ্গেও তাদের বিরোধ বাঁধে। তবে এর চেয়ে বেশি তীব্র হয়েছিল হিন্দু জমিদারদের প্রতিক্রিয়া।

চব্বিশ পরগনা এবং নদীয়া জেলার বহু কৃষক ও তাঁতী তিতুমীরের আন্দোলনে সাড়া দেয়। মুসলমান প্রজাদের সংঘবদ্ধ হতে দেখে স্থানীয় হিন্দু জমিদারদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। তারা তিতুমীরের অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির পথ বন্ধ করার উপায় খুঁজতে থাকে এবং প্রজাদের উপর অযথা উৎপীড়ন শুরু করে। তারাগুনিয়ার জমিদার রাম নারায়ণ, পূঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় এবং আরো অনেকে তাদের জমিদারিতে মুসলমান রায়তদের প্রত্যেকের দাঁড়ি রাখার উপর আড়াই টাকা হারে কর ধার্য করেন। সরফরাজপুরের প্রজাগণ এই অন্যায় কর প্রদানে অস্বীকার করলে তাদের উপর নেমে আসে অমানবিক অত্যাচার ও নির্যাতন। তিতুমীর এ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের কাছে সুবিচার চেয়ে সম্পূর্ণভাবে নিরাশ হন। শান্তিপূর্ণ উপায়ে অত্যাচারের প্রতিকার না হওয়ায় অবশেষে তিনি সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ বেছে নেন।

১৮৩১ সালের অক্টোবর মাসে তিতুমীর ও তাঁর সমর্থকরা তাদের প্রধান ঘাঁটি নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে একটি মজবুত বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করা হয়। গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে গড়ে উঠে একটি সুদক্ষ লাঠিয়াল ও প্রতিরোধ বাহিনী। এবার তিতুমীরের অনুসারীরা জমিদারদের অন্যায়ের প্রতিকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। লাউঘাটায় এক সংঘর্ষে জমিদার দেবনাথ রায় নিহত হন। পার্শ্ববর্তী অনেকগুলো গ্রামের উপর তিতুমীরের বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। জমিদারদের প্ররোচনায় মুলাহাটির নীলকুঠির পক্ষ থেকে তিতুমীরের সমর্থকদের বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা নেয়ায় তাঁর বাহিনী

নীলকুঠি আক্রমণ করে তা লুণ্ঠন করে কুঠির তত্ত্বাবধায়ককে বন্দি করে নিয়ে যায়। ভীত সন্ত্রস্ত জমিদার ও নীলকররা ইংরেজ সরকারের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন পাঠায়।

বৃটিশ সরকার শীঘ্রই তিতুমীরের বিরুদ্ধে বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠায়। কিন্তু তারা শোচনীয় পরাজয়বরণ করে এবং তাদের ১৫ জন নিহত ও বহু আহত হয়। আলেকজান্ডারকে সহায়তা দানের অভিযোগে তিতুমীরের সমর্থকরা কয়েকটি নীলকুঠি লুণ্ঠন করে। কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেট ৩০০ সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু এবারও ইংরেজ সৈন্যরা পরাজিত ও বিতাড়িত হয়। পরিশেষে ১৮৩১ সালের নভেম্বর মাসে মেজর স্কটের অধীনে এক বিরাট ইংরেজ বাহিনী নারিকেলবাড়িয়া আক্রমণ করে। তিতুমীরের সমর্থকরা সাহসের সাথে তুমুল লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। কিন্তু ইংরেজদের কামানের গোলার আঘাতে তিতুমীরের বাঁশের কেলা সহজেই ধ্বংস হয়। যুদ্ধে তিতুমীর ও তাঁর বহু অনুগামী শহীদ হন। সেনাপতি গোলাম মাসুমসহ প্রায় আড়াইশ জন বন্দি হন। বৃটিশ সরকার গোলাম মাসুমকে ফাঁসি দেয় এবং অন্যান্যদের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড প্রদান করে। এভাবে তিতুমীরের ধর্ম সংস্কার আন্দোলন যা পরিণতিতে জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার এবং ইংরেজ শাসন বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ নিয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ জমিদার ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিতুমীরের সংগ্রামের উপর একটি নাটিকা মঞ্চস্থ করবেন।

সারাংশ

তিতুমীরের আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মুখ্যত ধর্ম সংস্কার করা। যেসব অনৈসলামিক রীতিনীতি ও কুসংস্কার মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করে সেসব বর্জন করার জন্যই তিনি আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে জমিদার ও নীলকরদের স্বার্থের দ্বন্দ্বের ফলে এ আন্দোলন কৃষক আন্দোলনের রূপ নেয় এবং ইংরেজদের সাথেও বিরোধ সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। তিতুমীর জন্মগ্রহণ করেন
ক) নদিয়ায় খ) চব্বিশ পরগনায় গ) বারাসাতে ঘ) দিল্লিতে

২। তিতুমীর বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন
ক) উলুবেড়িয়ায় খ) চাঁদপুরে গ) নারকেল বাড়িয়ায় ঘ) সরফরাজপুরে

৩। তিতুমীর বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন
ক) ১৮২৮ খ্রি. খ) ১৮২৯ খ্রি. গ) ১৮৩০ খ্রি. ঘ) ১৮৩১ খ্রি.

৪। তিতুমীরের আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল–
ক) ধর্ম সংস্কার খ) রাজনৈতিক খ্যাতি লাভ গ) জনকল্যাণ ঘ) ইংরেজ শাসন উৎখাত

৫। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা ধ্বংস হয়?
ক) ১৮৩০ খ্রি. খ) ১৮৩১ খ্রি. গ) ১৮৩২ খ্রি. ঘ) ১৮৩৩ খ্রি.

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১ ঃ ১। খ ২। গ ৩। খ ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২ ঃ ১। ক ২। ক ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ ঃ ১। ক ২। ঘ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪ ঃ ১। ক ২। খ ৩। খ ৪। গ ৫। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ঘ ৪। ক ৫। খ